ভূমিকা

কল্যাণীয় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর

বহু লোক এসেছিল জীবনের প্রথম প্রভাতে —

কেহ বা খেলার সাথী, কেহ কৌতূহলী,

কেহ কাজে সঙ্গ দিতে, কেহ দিতে বাধা।

আজ যারা কাছে আছ এ নিঃস্ব প্রহরে,

পরিশ্রান্ত প্রদোষের অবসন্ন নিস্তেজ আলোয়

তোমরা আপন দীপ আনিয়াছ হাতে,

খেয়া ছাড়িবার আগে তীরের বিদায়স্পর্শ দিতে।

তোমরা পথিকবন্ধু,

যেমন রাত্রির তারা

অন্ধকারে লুপ্তপথ যাত্রীর শেষের ক্লিষ্ট ক্ষণে।

উদয়ন, ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১ - সকাল

১

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—

অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি

এই মহামন্ত্রখানি,

চরিতার্থ জীবনের বাণী।

দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু উপহার

মধুরসে ক্ষয় নাই তার।

তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে—

সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে।

শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর

ব'লে যাব তোমার ধূলির

তিলক পরেছি ভালে,

দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।

সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি,

এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি।

উদয়ন, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১ - সকাল

দুই

পরম সুন্দর

আলোকের স্নানপুণ্য প্রাতে।

অসীম অরূপ

রূপে রূপে স্পর্শমণি

রসমূর্তি করিছে রচনা,

প্রতিদিন

চিরনূতনের অভিষেক

চিরপুরাতন বেদীতলে।

মিলিয়া শ্যামলে নীলিমায়

ধরণীর উত্তরীয়

বুনে চলে ছায়াতে আলোতে।

আকাশের হৃৎস্পন্দন

পল্লবে পল্লবে দেয় দোলা।

প্রভাতের কণ্ঠ হতে মণিহার করে ঝিলিমিলি

বন হতে বনে।

পাখিদের অকারণ গান

সাধুবাদ দিতে থাকে জীবনলক্ষ্মীরে।

সবকিছু সাথে মিশে মানুষের প্রীতির পরশ

অমৃতের অর্থ দেয় তারে,

মধুময় করে দেয় ধরণীর ধূলি,

সর্বত্র বিছায়ে দেয় চিরমানবের সিংহাসন।

উদয়ন, ১২ জানুয়ারি, ১৯৪১ - দুপুর

৩

নির্জন রোগীর ঘর।

খোলা দ্বার দিয়ে

বাঁকা ছায়া পড়েছে শয্যায়।

শীতের মধ্যাহ্নতাপে তন্দ্রাতুর বেলা

চলেছে মন্থরগতি

শৈবালে দুর্বলস্রোত নদীর মতন।

মাঝে মাঝে জাগে যেন দূর অতীতের দীর্ঘশ্বাস

শস্যহীন মাঠে।

মনে পড়ে কতদিন

ভাঙা পাড়িতলে পদ্মা

কর্মহীন প্রৌঢ় প্রভাতের

ছায়াতে আলোতে

আমার উদাস চিন্তা দেয় ভাসাইয়া

ফেনায় ফেনায়।

স্পর্শ করি শূন্যের কিনারা

জেলেডিঙি চলে পাল তুলে,

যূথভ্রষ্ট শুভ্র মেঘ পড়ে থাকে আকাশের কোণে।

আলোতে ঝিকিয়া-ওঠা ঘট কাঁখে পল্লীমেয়েদের

ঘোমটায় গুণ্ঠিত আলাপে

গুঞ্জরিত বাঁকা পথে আম্রবনচ্ছায়ে

কোকিল কোথায় ডাকে ক্ষণে ক্ষণে নিভৃত শাখায়,

ছায়ায় কুণ্ঠিত পল্লীজীবনযাত্রার

রহস্যের আবরণ কাঁপাইয়া তোলে মোর মনে।

পুকুরের ধারে ধারে সর্ষেখেতে পূর্ণ হয়ে যায়

ধরণীর প্রতিদান রৌদ্রের দানের,

সূর্যের মন্দিরতলে পুষ্পের নৈবেদ্য থাকে পাতা।

আমি শান্ত দৃষ্টি মেলি নিভৃত প্রহরে

পাঠায়েছি নিঃশব্দ বন্দনা,

সেই সবিতারে যাঁর জ্যোতীরূপে প্রথম মানুষ

মর্তের প্রাঙ্গণতলে দেবতার দেখেছে স্বরূপ।

মনে মনে ভাবিয়াছি, প্রাচীন যুগের

বৈদিক মন্ত্রের বাণী কণ্ঠে যদি থাকিত আমার

মিলিত আমার স্তব স্বচ্ছ এই আলোকে আলোকে;

ভাষা নাই, ভাষা নাই;

চেয়ে দূর দিগন্তের পানে

মৌন মোর মেলিয়াছি পাণ্ডুনীল মধ্যাহ্ন-আকাশে।

উদয়ন, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১ - দুপুর, পূর্বপাঠ: ৭ পৌষ, ২২ ডিসেম্বর, ১৯৪০

৪

ঘন্টা বাজে দূরে।

শহরের অভ্রভেদী আত্মঘোষণার

মুখরতা মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেল,

আতপ্ত মাঘের রৌদ্রে অকারণে ছবি এল চোখে

জীবনযাত্রার প্রান্তে ছিল যাহা অনতিগোচর।

গ্রামগুলি গেঁথে গেঁথে মেঠো পথ গেছে দূর-পানে

নদীর পাড়ির ‘পর দিয়ে।

প্রাচীন অশথতলা,

খেয়ার আশায় লোক ব’সে

পাশে রাখি হাটের পসরা।

গঞ্জের টিনের চালাঘরে

গুড়ের কলস সারি সারি,

চেটে যায় ঘ্রাণলুব্ধ পাড়ার কুকুর,

ভিড় করে মাছি।

রাস্তায় উপুড়মুখো গাড়ি

পাটের বোঝাই ভরা,

একে একে বস্তা টেনে উচ্চস্বরে চলেছে ওজন

আড়তের আঙিনায়।

বাঁধা-খোলা বলদেরা